ঔপনিবেশিক বাংলায় নারীবাদী চিন্তাভাবনার গতিপ্রকৃতি : মেয়েদের কলমে

প্রিয়াঙ্কা মণ্ডল

Abstract

The social reformation movement of Bengal in nineteenth century revolved mainly around the livelihood of women. Though the position of women was closely associated with this but the society did not feel the necessity of taking the opinion of women; it rather expected their silence, lack of awareness and inactivity. So initially, the male reformers took prominent role in this reformation movement. Overall, the movement of women's liberation was initially detached from the decisions of women. But the educated women of that time did not accept this kind of silence expected by society. They raised their voice breaking this silence. From the late nineteenth century they expressed their opinions in public through their writings and the print media. In this article, I want to investigate the role of feminist consciousness of Bengali women of the period by analyzing their letters to editors and essays that got published in Bengali periodicals in the colonial period. At the same time, I will try to understand and focus on the dynamic nature of the thought process of Bengali Women because women of that time could not adopt any one-line approach as a strategy to fight with patriarchy. Sometimes they expressed their rebellious voice of protest against patriarchy; at other times they collaborated with male voices, or even followed the path of patriarchy as a strategy. Though sometimes their voices appeared to be in chorus with men but they did not fail to expose the distinct authenticity of their own arguments. In this paper I aim not just to search the ambitious, rebellious voice of women, but intend to focus on the thought processes of Bengali women by which one may identify their consciousness and subjective approach towards gender equality.

Keywords: *Feminism, Patriarchy, Strategy, Subjectivity.*

উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়কালে বাঙালি মেয়েরা তাদের নিজস্ব ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছিল তাদের লেখনীর মাধ্যমে। দীর্ঘকাল যাবৎ পুরুষতন্ত্রের বয়ানের নিচে চাপা পড়ে থাকা কণ্ঠস্বর একটু একটু করে খুঁজে পেতে শুরু করেছিল প্রকাশের আলো। উনিশ শতকের বাংলার নব্যযুগীয় সংস্কারপন্থী নারীহিতৈষী পুরুষেরা মেয়েদের উন্নতিসাধনের জন্য যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন তার গুরুত্বকে

কোনোভাবেই অস্বীকার যায় না। কিন্তু তাঁরা কখনোই নারীর নিজস্ব ইচ্ছা–অনুভূতি বা মতামত জানার প্রয়োজন মনে করেননি। এক কথায় উনিশ শতকের বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন ছিল নারীর সিদ্ধান্ত বর্জিত। সংস্কারসাধনের বিষয়ে বরাবরই মহিলাদের অসচেতনতা ও নীরবতাই কাঙ্ক্ষিত ছিল। পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি নারীর সমস্যাগুলিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে তার থেকে অনেকটাই আলাদা হয় নারীর দেখার ধরণ, ব্যাখ্যার ধরণ। কারণ জৈবিক দিক থেকে তো বটেই, সামাজিক অবস্থানের দিক থেকেও তারা পুরুষের থেকে আলাদা, তাই তাদের বয়ান, ভাষাপ্রকরণ একজন নারীর অনুভূতিকে যেভাবে ব্যক্ত করতে পারে, পুরুষের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়এই উপলব্ধি থেকেই সমাজ–প্রত্যাশিত নীরবতাকে ভেঙে সে যুগের শিক্ষিতা মেয়েরা এগিয়ে এসেছিল তাদের নিজস্ব কণ্ঠস্বর শোনাতে। তাঁরা তাঁদের লেখনীকে হাতিয়ার করে নিজস্ব বক্তব্যকে জনসমক্ষে তুলে ধরেছিলেন মুদ্রিত মাধ্যমের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি ঔপনিবেশিক কালপর্বে বাংলা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদককে উদ্দেশ্য করে লেখা মেয়েদের চিঠি এবং প্রবন্ধ বিশ্লেষণের মাধ্যমে অন্বেষণ করার চেষ্টা করেছি সমকালীন বাঙালি মেয়েদের মধ্যে কোনোরকম নারীবাদী চেতনার জাগরণ ঘটেছিল কিনা? সেই সঙ্গে বোঝার চেষ্টা করেছি সেই সময়ের বাংলার মেয়েদের ভাবনার জগতটাকে। কেবলমাত্র মেয়েদের উচ্চকিত প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরের খোঁজ করাই আমার এই প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, সামগ্রিকভাবে, ঔপনিবেশিক কালপর্বে বাংলার মেয়েদের নিজস্ব ভাবনা ও তার গতিপ্রকৃতির উপর আলোকপাত করাই আলোচ্য প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ভারতবর্ষে নারীবাদ সংক্রান্ত যাবতীয় ধ্যানধারণা আবর্তিত হয় পশ্চিমী নারীবাদকে কেন্দ্র করে। নারীবাদ বলতে আমরা যা বুঝি তার ষোলো আনাই নির্ধারিত হয় পশ্চিমী নারীবাদী তত্ত্ব দ্বারা। তাই পশ্চিমী দুনিয়ায় উদ্ভূত বিভিন্ন নারীবাদী তরঙ্গকে ভিত্তি করেই চলতে থাকে এদেশের নারীবাদী পর্যালোচনা। এই পশ্চিমী নারীবাদী তত্ত্বের মাপকাঠি অনুযায়ী দেখতে গেলে, ভারতবর্ষে নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭০ এর দশকে। কিন্তু এর আগে ঔপনিবেশিক কালপর্বে ভারতীয় উপমহাদেশ তথা বাংলার মেয়েদের মধ্যে কি কোনোরকম নারীবাদী চেতনার জাগরণ ঘটেনি? এর উত্তরে অধিকাংশ নারীবাদী তাত্ত্বিকরাই নেতিবাচক মন্তব্য করেছেন। মানবী–ইতিহাসচর্চার শুরুর দিকে পশ্চিমী নারীবাদী তাত্ত্বিকরা ঔপনিবেশিক কালে ভারতীয় মেয়েদের নারীবাদী চেতনার ধারণাকে নস্যাৎ করেছেন। Miriam Schneir এপ্রসঙ্গে Feminism: The Essential Historical Writings(১৯৭২) বই তে মন্তব্য করেছেন যে,

> No feminist works emerged from behind the Hindu purdah or out of Moslem harems centuries of slavery do not provide a fertile soil for intellectual development or expression.[১]

আবার কোনো কোনো ঐতিহাসিক ঔপনিবেশিক ভারতীয় উপমহাদেশের মেয়েদের মধ্যে নারীবাদী চেতনার জাগরণের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক বিভিন্নতা লক্ষ্য করেছেন। Meredith Borthwick তাঁর The Changing Role Of Women in Bengal: ১৮৪৯–১৯০৫বইতে[২] ঔপনিবেশিক কালপর্বে বাংলার মেয়েদের পরিবর্তনশীল অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, ওই সময়ে বাংলার মেয়েরা ছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রকৃতির। তাদের মধ্যে নারীবাদী চেতনা ছিল না বা থাকলেও তা ছিল খুবই নিষ্প্রভ। মারাঠী মেয়েদের মধ্যে সমাজনির্মিত লিঙ্গবৈষম্যের ব্যাপারে যে ধরনের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়, বাংলার মেয়েদের মধ্যে তেমন সচেতনতা তিনি লক্ষ্য করেননি। বরং তারা এক প্রকার বিনা প্রশ্নে পিতৃতন্ত্রের দাপট মেনে নিয়েছিলেন বলেই মন্তব্য করেছেন বর্থউইক। অন্যদিকে অধ্যাপক পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর Nationalist resolution of the womens question (১৯৮৯) প্রবন্ধে[৩] উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে নারী সমস্যার জাতীয়তাবাদী সমাধান হয়েছিল বলেই মন্তব্য করেছেন। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছেন, ওই সময় থেকে মেয়েরা বিনা প্রশ্নে এই সমাধান মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু মানবী–ইতিহাসচর্চার অন্যতম পথিকৃৎ Geraldine Forbes তাঁর Caged Tigers: First Wave Feminists in India(১৯৮২) নামক প্রবন্ধে Miriam Schneir এর ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। তিনি তাঁর Caged Tigers: FirstWave Feminists in India (১৯৮২) নামকপ্রবন্ধে লিখেছেন:

> If we agree on a straightforward definition of feminism as a set of doctrines on the place of women in society, and on the extent to which women should have equal rights, opportunities and responsibilities with those of men..., then feminism existed in India. Indian women wrote and spoke about womens condition, formed organizations to secure desired changes, and eventually had an impact on the institutions of their society.[৪]

অধ্যাপক শমিতা সেন এর মতে, ১৯৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে ভারতে স্বয়ংক্রিয় নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হলেও, এই আন্দোলনের একটা পূর্ববর্তী অধ্যায় ছিল যেটিকে তিনি প্রথম মহিলা আন্দোলন বা first women's movement[৫] বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, নব্যনারী ১৮৮০–র দশক থেকে সরব হতে শুরু করেন এবং এরপর থেকেই ভারতীয় মহিলারা ধীরে ধীরে বাইরের জগতে প্রবেশ করতে শুরু করেন। বিভিন্ন নারী সংগঠন গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন এবং জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। অধ্যাপক সেন বিংশ শতকের কুড়ি–ত্রিশের দশককে ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা আন্দোলনের সূচনাকাল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সবক্ষেত্রেই যে প্রকাশ্য আন্দোলন কিংবা সভা–সমিতির মধ্য দিয়ে

মেয়েদের সক্রিয়তা প্রকাশিত হয় তা নয়। বরং, বঙ্গদেশের মহিলাদের মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে নারীবাদী সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছিল তাঁদের কলমের মাধ্যমে। নারীবাদ বলতে একেবারে সাধারণ অর্থে যা বোঝায় (সমাজে নারীপুরুষ সম্পর্কের মধ্যেকার অসাম্য বিষয়ে সচেতনতা এবং এই অসাম্য দূরীকরণের জন্য সোচ্চার হওয়া) তার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায় উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে লেখা বাঙালি মেয়েদের বিভিন্ন ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে। পশ্চিমী মহিলাদের মত প্রত্যক্ষভাবে জনপরিসরে নেমে তাঁরা নিজেদের অধিকারের লড়াইয়ে সামিল না হলেও বিভিন্ন পত্রপত্রিকার পাতায় শোনা গেছে তাঁদের পিতৃতন্ত্র বিরোধী সোচ্চার কণ্ঠস্বর। তারাবাঈ সিন্দে, পন্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী, লক্ষ্মীবাঈ তিলক প্রমুখ মারাঠী মহিলাদের কলমে যখন পিতৃতন্ত্র বিরোধী জ্বালাময়ী লেখা প্রকাশ পাচ্ছিল তখন বাঙালি মহিলারাও নীরব ছিলেন না কোনোভাবেই। মায়াসুন্দরী, বামাসুন্দরী, স্বর্ণকুমারী, কৃষ্ণভাবিনী দাস থেকে শুরু করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সরলাদেবী, অনিন্দিতা দেবী, রাধারাণী দেবী, শান্তা দেবী, খায়েরুন্নেসা, বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, শামসুন নাহার প্রমুখ অনেক বাঙালি মহিলারাই সরব হয়েছিলেন বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকার পাতায়। তাঁদের রচনায় খুঁজে পাওয়া যায় নারী–পুরুষের অসাম্যকে, মেয়েদের অধস্তনতাকে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস। খুঁজে পাওয়া যায়, পুরুষ আধিপত্য কায়েম হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা, পিতৃতান্ত্রিক ধ্যান–ধারণা কিভাবে মেয়েদের মননকে শৃঙ্খলিত করে সে সম্পর্কে সোচ্চার বক্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষা ও স্বনির্ভরতাপ্রসঙ্গ :

নারীমুক্তির জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন ছিল নারীশিক্ষার বিকাশ। তবে শুধুমাত্র অক্ষরজ্ঞান হওয়া বা একটু আধটু লিখতে পড়তে পারাই প্রকৃত শিক্ষা নয়। প্রকৃতশিক্ষা হল সেই শিক্ষা যার মধ্য দিয়ে নারীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা, সচেতনতা, নৈতিকবোধের বিকাশ ঘটবে, যুক্তিপূর্ণ মন মস্তিষ্ক গঠিত হবে এবং নারী তার আপন অধিকার সম্পর্কে জাগরিত হবে। উনিশশতকের সমাজ নারীর মধ্যে প্রকৃতশিক্ষার বিস্তার সম্পর্কে আদৌ কতটা আগ্রহী ছিল সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে, তথাপি স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের ফলে মেয়েদের মধ্যে যতটুকু জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়েছিল সেই জ্ঞানকে পাথেয় করে মেয়েরা লেখার জগতে পদার্পণ করেছিলেন। তাঁরা ধীরে ধীরে অনুভব করেছিলেন মেয়েদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা। তবে পুরুষ নির্ধারিত উদ্দেশ্য (মেয়েদেরকে সুগৃহিণী, সুমাতা হিসেবে গড়ে তোলা)–কে সামনে রেখেই যে সে যুগের সিংহভাগ মহিলারা স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা তাঁদের কলমে তুলে ধরেছিলেন, তা সহজেই ধরা পড়ে বিবি তাহেরণ নেছা, মানকুমারী বসু, নগেন্দ্রবালা

মুস্তাফী প্রমুখের লেখা প্রবন্ধগুলিতে। ১৮৬৫ সালে বিবি তাহেরণ নেছা নামে একজন মুসলমান বালিকা *বামাবোধিনী*র পাতায় লিখেছেন–

> বিদ্যার্জন দ্বারা যদি স্ত্রীগণের হৃদয় আকাশ জ্ঞানশশীর আলোকে আলোকিত হয়, তবে তাহারা এই নিখিল ভূমন্ডলে সুশৃঙ্খলার সহিত সংসারধর্ম প্রতিপালন পূর্বক আপনার ও স্বীয় পরিবারের যে কত অনির্বচনীয় আনন্দোপত্তি করিতে পারে তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না।[৩]

এমনকি নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী সংগীতবাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক (বামাবোধিনী পত্রিকা, ভাদ্র ১৩০১) নামক প্রবন্ধে[৭] স্ত্রীলোকের সংগীতবাদ্য শিক্ষার আবশ্যকতার জন্য যে যে কারণগুলি তিনি দেখিয়েছেন তার মধ্যে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে সংসারের সুখশান্তির বিষয়টি। মহিলারা বীণা বাজিয়ে গান গাইতে শিখলে স্বামীরা আর কুপথগামী হবে না, ঘরের সম্পদও রক্ষা পাবে আর দম্পতিদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে না এই ছিল তাঁর বক্তব্যের সারকথা।

মানকুমারী বসুর রচনায়ও একই সুরের অনুরণন শোনা যায় শিক্ষিত হও, সংসারের কল্যাণ সাধনের জন্য, সুপুত্র পালনের জন্য, স্বাস্থ্য সম্পদে পরিবার সমৃদ্ধ করার জন্য। নারীর নিজবিকাশের জন্যেও যে শিক্ষার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে– সেই বিষয়টি অধিকাংশ লেখায় গুরুত্ব পায়নি। মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হবে–তার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কখনোই শোনা যায়নি পুরুষ কণ্ঠে। বরং বিরুদ্ধতাই করেছে বেশি। তবে স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দেবী, মধুমতী মুখোপাধ্যায়, শান্তা দেবীর মতো বেশ কিছু মহিলাদের লেখায় উঠে এসেছে সুমাতা, সুপত্নী হওয়ার পাশাপাশি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন ঠিক কতটা? সেই প্রসঙ্গে মধুমতী মুখোপাধ্যায় স্ত্রীশিক্ষার লক্ষ্য সম্পর্কে লিখেছেন –

> এ দেশের স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাবতী হইলে পুস্তক রচনা দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া ইচ্ছামত ব্যয় করিতেও পারেন এবং দৈববশতঃ যদি দৈন্যদশায় পতিত হয়েন তাহা হইলে সংসার যাত্রাও নির্বাহ করিতে পারেন।[৮]

কৃষ্ণভাবিনী দাস তাঁর শিক্ষিতা নারী (সাহিত্য, আশ্বিন ১২৯৮) প্রবন্ধে[৯] আলোচনা করেছেন কিভাবে ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় মেয়েরা উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উকিল, কেরানি, ডাক্তার, আইনজ্ঞ হিসেবে কিংবা বই লিখে স্বনির্ভর হয়েছে। আর এই স্বনির্ভরতা অর্জনের পাশাপাশি তারা সংসারটিকেও কিভাবে সযত্নে সুন্দরভাবে সামলাচ্ছে সে বিষয়টিকেও তুলে ধরেছেন তাঁর লেখার মাধ্যমে। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষিত হলে মেয়েদের মধ্যে নারীসুলভ গুণাবলী লোপ পায় তৎকালীন সমাজের এই তথাকথিত ধারণা যে কতটা ভিত্তিহীন তারই উদাহরণ স্বরূপ তিনি তুলে ধরেছেন

পাশ্চাত্য মহিলাদের সংসার ও কর্মজগতের সাফল্যের দৃষ্টান্ত।

তবে তৎকালীন ভারতীয় সমাজ যে মেয়েদের স্বাবলম্বনের উদ্দেশ্যে উচ্চশিক্ষা দিতে একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না তা স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষিতা নারী প্রবন্ধটির সমালোচনার মধ্য দিয়ে। সাধনা পত্রিকার ১২৯৮ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় সাময়িক সাহিত্য সমালোচনায় শিক্ষিতা নারীর সমালোচনা করে লিখেছেন–

> পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া অর্থোপার্জ্জন স্ত্রীলোকের কার্য্য নহে। ...যিনি প্রকৃতির নির্দেশানুসারে সংসারের মা হইয়া জন্মগ্রহণ করেন তিনি যে শিক্ষালাভ করিবেন তাহা বিক্রয় করিবার জন্য নহে, বিতরণ করিবার জন্য।[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনার উত্তরে কৃষ্ণভাবিনী লেখেন–

> স্ত্রীজাতি এ জগতে জ্ঞানবুদ্ধিহীনা হইয়া কেবল দাসত্ব করিবার জন্যই সৃজিত হয় নাই কিংবা পুরুষের ক্রীড়ার নিমিত্ত ও তাহারা গঠিত নহে। পরোপকার... যেমন নারীর উদ্দেশ্য, রমণী তেমনি নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।[১১]

তবে এরকম বক্তব্যের পাশাপাশি তিনি একথাও লিখেছেন যে–

> ...নারীদিগকে উচ্চশিক্ষা দিলেই, তাহারা সকলে যে কানে কলম গুঁজিয়া আফিসে আফিসে কাজের উমেদারি করিয়া বেড়াইবে...ইহা কি কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন? তবে যাহাদের ভরণপোষণ করিবার কেহ নাই...তাহারা যদি আত্মীয়দের কাছে ভিক্ষার পরিবর্তে নিজে উপার্জন করিয়া পরিবার পালন করিতে পারে...।[১২]

অর্থাৎ কৃষ্ণভাবিনী দাসীর লেখার মধ্যেও একধরনের স্ববিরোধিতার ছাপ লক্ষ করা যায়। মধুমতী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী উভয়েই মেয়েদের বিদ্যাশিক্ষাকে উপার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বলে মনে করলেও, নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সাংসারিক প্রয়োজনকে। সংসারে অভাব–অনটনের সম্মুখীন হলে অন্যের কাছে ভিক্ষাবৃত্তি করে জীবন অতিবাহিত না করে মেয়েরা যাতে সসম্মানে উপার্জন করতে পারে সেই কারণেই মেয়েদের বাল্য বয়স থেকে শিক্ষার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার কথা বলেছেন ঠিকই কিন্তু তা তার দুঃসময়ের প্রয়োজনের কথা ভেবে। বিবাহিতা হোক কিংবা অবিবাহিতা, আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকুক বা না থাকুক, সব অবস্থাতেই পুরুষের মতো নারীরও উপার্জন কর্ত্তব্য এরকম ভাবনা–চিন্তার নিতান্তই অভাব ছিল। স্বাধীন উপার্জনের প্রয়োজনীয়তার ধারণা যে তখনও বাঙালি নারীর চিন্তায় অপরিহার্য হয়ে উঠতে পারেনি, তারই স্পষ্ট আভাস ফুটে উঠেছে তৎকালীন মেয়েদের লেখা প্রবন্ধগুলিতে। বিশ শতকের ত্রিশের দশকে

পৌঁছেও শান্তা দেবী লিখেছেন, সংসারধর্ম বজায় রেখেও কিভাবে মেয়েরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারে সে বিষয়ে,

> অধ্যাপনা, শুশ্রূষা, চিকিৎসা ইত্যাদি কাজের বিষয়ে মতভেদ থাকতে পারে না ...এমন কাজ যা ঘরে বসে এবং ডাক ও রেলের সাহায্যে করা যায়। ...কুটির শিল্পের সম্মান বেড়েছে...নানারকম পুস্তক রচনা, সঙ্কলন, পত্রিকা ও পুস্তক সম্পাদন...বিজ্ঞাপনের...ছবি আঁকিয়া দেওয়া.....আরো অনেক কাজ আছে। ...সন্তান-সন্ততি বড় হলে অথবা অন্য কারণে ভারমুক্ত হলে...হাতে কলমে একা যে কাজের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন, পরিণত বয়সে দশজনকে খাটিয়ে নিজে পরিচালনার ভার নিয়ে সেটা আরো অনেক উন্নত ও উচ্চ আদর্শে গড়ে তুলতে পারবেন।[১৩]

অর্থাৎ তাঁরা শুধু পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করেই পথের সন্ধান করেনি বরং সে যুগের মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের সাথে আপস-রফার মধ্যে দিয়েও কিভাবে নিজেদের জন্য পরিসর তৈরী করে নেওয়া যায় সেই চেষ্টাই করেছিলেন।

স্ত্রীস্বাধীনতা ও লিঙ্গসাম্য :

উনিশ শতকের নারীহিতৈষী পুরুষের কণ্ঠে কখনোই শোনা যায়নি লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা। মেয়েরাই প্রথম চিহ্নিত করেছে নারী-পুরুষ অসাম্যকে লিঙ্গভিত্তিক শোষণ-বঞ্চনা, অবহেলা-যন্ত্রণাকে। মেয়ে হয়ে জন্মানোর সাথে সাথেই কিভাবে তাদেরকে সমাজের বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হতে হয় সে বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে মায়াসুন্দরী দেবীর লেখা 'নারীজন্ম কি অধর্ম' (*বঙ্গমহিলা*, শ্রাবণ ১২৮২) প্রবন্ধটির মধ্য দিয়ে— 'আমাদিগের জন্মাবধিই পোড়া কপাল। ভূমিষ্ট হইবা মাত্র পিতামাতা আত্মীয়স্বজন সকলেই বিমর্ষ। মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি পর্যন্ত হইল না।'[১৪] জন্মানোমাত্রেই মেয়েদের প্রতি তার পিতা, পরিবার কিংবা সমাজ তাচ্ছিল্য করে এই ভেবে যে, মেয়েরা তাদের কোনো কাজেই লাগবে না, এমনকি বৃদ্ধ বয়সে পিতামাতার ভরণপোষণের দায়টুকুও পালন করতে অক্ষম মেয়েরা। উপরন্তু মেয়েদের বিবাহের সময় পাত্রস্থ করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হতে হয় তার পিতাকেই। কিন্তু এ দোষ কাদের? এর জন্যেও কি মেয়েরাই দায়ী? এইভাবে মেয়েদের জন্য তৈরী পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রচলিত নিয়মগুলিকেই সরাসরি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন মায়াসুন্দরী দেবী। মেয়েরাই প্রথম উপলব্ধি করেছে পরাধীন ভারতবর্ষে পুরুষের পরাধীনতা শুধুমাত্র বাইরে। আর নারীর ঘরে বাইরে সর্বত্র। তাদের কলমে উঠে এসেছে জন্মকাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ঘরে-বাইরে কিভাবে মেয়েরা লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যের শিকার হয় তার

বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ। আমাদের দেশে পুরুষের পরাধীনতা ও নারীর পরাধীনতার মধ্যে যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে তাও বুঝতে পেরেছিলেন মায়াসুন্দরীদেবী। তিনি লিখেছেন, 'আপনারাও যেরূপ ইংরাজদিগের পদানত, আমরাও তদ্রূপ। বেশিরভাগে আমরা পুরুষদিগেরও সম্পূর্ণ অধীন। পুরুষ গৃহে স্বাধীন, বাহিরে অধীন, আমরা বাহিরেও অধীন ঘরেও অধীন।'[১৫] তবে উনিশ শতকের শেষের দুই দশক থেকেই লিঙ্গসমস্যা চিহ্নিত রচনার মধ্য দিয়ে নারীবাদী চিন্তার আরও বলিষ্ঠতর সুর ও স্বরের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল প্রাবন্ধিক স্বর্ণকুমারী দেবী, কৃষ্ণভাবিনী দাসী, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কলমে। উনিশ শতকের বাংলায় নারী বিষয়ক আলোচনার জগতে পশ্চিমী নারীবাদী তত্ত্বের প্রথম প্রবেশ ঘটেছিল স্বর্ণকুমারী দেবীর হাত ধরেই। ১২৯৫ বঙ্গাব্দে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে থাকাকালীন স্বর্ণকুমারী দেবী নারী–পুরুষের সমতা নিয়ে লিখলেন 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' নামক প্রবন্ধটি। নারী সম্পর্কিত সামাজিক রীতিনীতি কিংবা নারী–পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে আলোচনা আগেও হয়েছে, কিন্তু এবার প্রশ্ন উঠেছিল নারী–পুরুষের সামর্থ্যের সমতা বিষয়ে। তাঁর লেখা 'পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব' প্রবন্ধটির আলোচনার মধ্য দিয়ে নারীবাদী চিন্তার Sex / Gender দ্বৈততার মধ্যেকার বিতর্কটির স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

এ ব্যাপারে পুরুষের শ্রেষ্ঠতার ধারণাকে আক্রমণ করে স্বর্ণকুমারী দেবী লিখেছেন, পুরুষের শ্রেষ্ঠতার মূলে রয়েছে যুগ যুগ ধরে নারীর প্রতি হওয়া সামাজিক অবদমন। সেই অবদমন থেকে নারীকে মুক্তি দিয়ে কিছুকাল মেয়েদেরকেও পুরুষের সঙ্গে সমানভাবে জ্ঞানচর্চার সুযোগ দেওয়ার পরেই নারী–পুরুষ উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার পরীক্ষা নেওয়া সঙ্গত।[১৬] রমাবাঈয়ের বক্তব্যের বিরোধিতা করে *ভারতী*–র পাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের করা মন্তব্য (... মেয়েদের একরকম গ্রহণশক্তি ধারণাশক্তি আছে, কিন্তু সৃজনশক্তির বল নেই)–এর বিরোধিতা করে স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর 'রমাবাই' প্রবন্ধে লিখেছেন

> স্ত্রীলোকের...সৃজনশক্তি নাই একথা লেখক কীরূপে স্থির করিলেন তাহা তো বুঝিতে পারিনা। ইউরোপে স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ আর কতদিন হইয়াছে, ইহার মধ্যেই কত উচ্চ উৎকৃষ্ট উপন্যাস স্ত্রীলোকের লেখনী–নির্গত হইয়াছে, তাহা লেখক ভুলিলেন কেন?[১৭]

স্বর্ণকুমারী দেবী আরও লিখেছেন মিসেস হেমান্স, মিসেস ব্রাউনিং কোনো অংশেই বার্নস এর চেয়ে নিকৃষ্ট কবি নন, অর্থাৎ কাব্যে রচনাতেও মহিলারা যথেষ্ট সৃজনবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। সুতরাং নারী–পুরুষের মধ্যে সৃজনশক্তির রূপভেদ থাকলেও ক্ষমতার বিকাশে কেউ হীন বা নিকৃষ্ট নয়। বরং কোনো পুরুষের সৃজনশক্তি এখনও

জর্জ এলিয়টকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়নি বলে জানিয়েছেন স্বর্ণকুমারী।[১৮]

এইভাবে যুক্তি পালটা যুক্তির দ্বারা নারী–পুরুষের সাম্যতা প্রমাণ করার চেষ্টা চলছিল। ১২৯৬ বঙ্গাব্দে *ভারতী* ও *বালক* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় কৃষ্ণভাবিনী দাসের 'স্ত্রীলোক ও পুরুষ' নামক প্রবন্ধটি বাংলায় লিঙ্গনির্মাণ বিষয়ক আলোচনাকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বলা যায়। কৃষ্ণভাবিনী তাঁর সুদীর্ঘ লেখায় নারী–পুরুষের সাম্যতার ধারণাকেপ্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। তিনি নারীর মেয়েলি গুণাবলী এবং পুরুষের পুরুষালি গুণগুলি যে সামাজিকভাবে নির্মিত সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন–

> ...স্ত্রীজাতি কেবল পুরুষের জন্যই সৃজিত হইয়াছে, ও ঐ উদ্দেশ্য ব্যতীত উহাদের জীবনের অন্য কোনো অভিপ্রায় থাকিতে পারে না, এই অসভ্য ও ঘৃণিত ধারণা স্ত্রীদের সংসারে সাম্য জ্ঞান ও সম অধিকার লাভের পক্ষে সর্বাপেক্ষা বিপদজনক ও সাংঘাতিক বাধা। ...পুরুষ যেমন কেবল স্ত্রীদের ব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হয় নাই, নারীও সেইরূপ শুধু পুরুষের নিমিত্ত জন্মায় নাই। ...স্ত্রীজাতির অতি অল্প স্বাভাবিকহীনতা ও জননীর কর্তব্য...এ অক্ষমতা এরূপ নহে যে তাহার জন্য নারীজাতি ...সমস্ত কাজ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত থাকিতে পারে, কিংবা মানবজাতির যেসব অধিকারে পুরুষের দখল আছে, সেইসব স্বত্ব হইতে তাহারা বঞ্চিত ইহা অস্বীকার করা যাইতে পারে।[১৯]

কৃষ্ণভাবিনী দাসের এই মন্তব্য নারী–পুরুষ সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর আধুনিক, যুক্তিসিদ্ধ মানসিকতার পরিচায়ক হয়ে ওঠে। পুরুষ প্রতাপকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লেখা তাঁর এই প্রবন্ধের বক্তব্য যে পুরুষসমাজ নির্বিবাদে মেনে নেবে না তা সহজেই অনুমেয়। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের *ভারতী*–র বৈশাখ সংখ্যায় 'শ্রী যোঃ' এবং বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা স্ত্রী ও পুরুষ বিষয়ে প্রকাশিত দুটি লেখাতে কৃষ্ণভাবিনীর নাম উল্লেখ না করে তাঁর মতামতের বিরোধিতা করা হয়েছে। নারী–পুরুষের সমতার প্রশ্নটিকে নস্যাৎ করে তাঁরা নারী–পুরুষের পৃথক গুণ, পৃথক ক্ষেত্রের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

এই সমস্ত বিরোধিতা সত্ত্বেও নারী–পুরুষের সাম্যের ভাবনা থেমে থাকেনি। ১৩০১ বঙ্গাব্দে *ভারতী* পত্রিকার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর পরিণত বয়সে লেখা বিষম সমস্যা প্রবন্ধে নারী–পুরুষের সমান অধিকার এবং নারীর স্বাধিকার বিষয়ে যুক্তিপূর্ণ দাবি উপস্থাপিত হয়েছে। নারীর স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকারের বিরুদ্ধে পুরুষেরা যুক্তির নামে যে–সব অযৌক্তিক কথা বলে থাকে তা নস্যাৎ করেছেন গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী। '...কোমলাঙ্গী রমণী কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে বিচরণ করিলে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য রমণীয়তা প্রভৃতি কমনীয় গুণগুলি বিনষ্ট হইবে' পুরুষের এই যুক্তিকে খণ্ডন

করে গিরীন্দ্রমোহিনী লিখেছেন:

> সন্তানপালন ও গৃহস্থালীর মধ্যে...বাটনা বাটা, রন্ধন, গৃহমার্জ্জন প্রভৃতি সমস্ত কর্ম্মে কোমলতা বা সৌন্দর্য্যহানি যথেষ্ট হইয়া থাকে। তবে নারী যদি চাকরাণীগীরি ছাড়িয়া কেরানী বা শিক্ষয়িত্রী প্রভৃতি অন্য কোনরূপ কার্য্য করেন তাহাতে কি এতই অধিক অনিষ্ট হইবে...আর কর্ম্ম করিলে যদি সৌন্দর্য্য নষ্ট হয় হউক। এতদিন রমণীর জ্ঞানের অভাবে, ...পূর্ণ মনুষ্যত্বের অভাবে যদি পুরুষদিগের ও সমাজের কোনো ক্ষতি না হইয়া থাকে ... তাহা হইলে যাহা ক্ষণিক বই রয় না, সে চঞ্চল শ্রী-সৌন্দর্য্যের অভাবেও কিছু ক্ষতি হইবে না ![১০]

উনিশ শতকের শেষের দশকে *ভারতী* পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এইভাবে স্বর্ণকুমারী-কৃষ্ণভাবিনী-গিরীন্দ্রমোহিনী নারীবাদের কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার তাত্ত্বিক ভিত্তি নির্মাণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তাঁরা শুধুমাত্র মেয়েদের অন্তঃপুরের অবরোধমুক্তি কিংবা শিক্ষিত ভদ্রমহিলা হয়ে ওঠাই যথেষ্ট বলে মনে করেননি। বরং সমাজনির্দিষ্ট মেয়েলি আদর্শ (যৌনতা, সৌন্দর্য, দুর্বলতা-কমনীয়তা) এর অবরোধকে ভেঙ্গে মেয়েদের কে সর্বস্তরীয় লিঙ্গবৈষম্য থেকে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন আর এখানেই ধরা পড়েছে তাঁদের আধুনিকতা। বিশ শতকের প্রাবন্ধিক সরলাদেবী চৌধুরানী, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, অনিন্দিতাদেবী, রাধারাণীদেবী-র রচনাতেও প্রতিফলিত হয়েছে এমনই নারীচেতনাবাদ।

১৩৩০ বঙ্গাব্দের *মাসিক বসুমতী* পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত 'নারীমন্দির' প্রবন্ধটিতে সরলাদেবী নারীবাদী তত্ত্বের বিতর্কিত কিছু ধারণা নিয়েই আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় উঠে এসেছে Sex / Gender দ্বৈততার বিতর্কটি । তিনি সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত স্ত্রীলিঙ্গ / পুরুষ লিঙ্গের ধারণাকে নস্যাৎ করে সকলকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে লিখেছেন, 'নারীর ''নারীত্ব'' বা পুরুষের ''পুরুষত্ব'' বলিলে যাহা বুঝা যাইবে, তাহা নারী বা পুরুষ উভয়েরই তটস্থ লক্ষ্মণ স্বরূপ লক্ষ্মণ নহে। স্বরূপ লক্ষ্মণ দুইজনেরই এক-তাহা...''মনুষ্যত্ব''। এছাড়াও তিনি *মনুসংহিতার* নারীবিদ্বেষী অনুশাসনকে আক্রমণ করে লিখেছেন-

> ...মনুর যুক্তি অনুসারে পুরুষকে হাতে রাখা, পুরুষকে স্ত্রীতন্ত্র করাই মেয়েদের স্বার্থ। কিন্তু শাস্ত্রের ব্যবস্থাগুলি সব পুরুষের একার গড়া, মেয়েদের ভোট বা সম্মতি লইয়া গঠিত হয় নাই সুতরাং ন্যায়তঃ অর্থাৎ কানুনতঃ পুরুষকে স্ববশে রাখিতে না পারায় সময়ে অসময়ে ছলে বলে কৌশলে সেটি তাহাদের করিতে হইয়াছে। খুশী রাখিয়া, ভুলাইয়া সবই আদায় করিতে পার, কিন্তু অধিকারের দোহাই দিয়া নয়— কেন না অধিকারগুলি সব পুরুষের নিজের হাতে রাখা, নিজের রচিত আইনের লৌহ প্রাচীরে

ঘেরা, সেখানে নারীরপ্রবেশ নিষেধ।[২১]

বিশ শতকের আরেক লেখিকা যিনি বঙ্গনারী ছদ্মনামে নারী সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে লেখা অসামান্য প্রবন্ধের সম্ভার রেখে গেছেন পত্রিকার পাতায় তিনি হলেন অনিন্দিতা দেবী। তিনি প্রায় আড়াই দশক ধরে পত্র–পত্রিকায় তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর মাধ্যমে সমাজের গভীরে গ্রথিত লিঙ্গবৈষম্যের ধারণাকে খণ্ডন করে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে গেছেন। তিনি মনে করেন, পুরুষালি এবং মেয়েলি গুণ বলে কিছু হয় না। তিনি সমাজের কাছে প্রশ্ন রেখেছেন 'নরনারীর সাম্য বুঝিতে বৈচিত্র্যহীনতা ও একাকার হওয়া বোঝেন কেন? দুইটি ভিন্ন জিনিসকেও কি একমূল্য দেওয়া যায় না?'[২২]

পুরুষতন্ত্রের তৈরী করা সতীত্ব ও পাতিব্রত্যের বিধানকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন সে যুগের মহিলারা। 'বিধবার পুনর্বিবাহে সতীত্ব ক্ষুণ্ণ হয়' সমাজের এমন মন্তব্যের বিরোধিতা করে জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখেছিলেন 'এমন সতী থাকিবার দরকার কি? যে উপায় নাই বলিয়া সতী, যে জ্ঞানহীন সংস্কারের দ্বারা সতী, তাহার সতীত্বের মূল্য কি? তাহার সতীত্ব অভাবাত্মক ধর্ম্মমাত্র।'[২৩] অনিন্দিতা দেবীও মেয়েদের পাতিব্রত্য ধর্মকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লিখেছিলেন— 'সকলেই যে সীতা–সাবিত্রীর দাবি করেন, তাঁহারা সকলেই রাম ও সত্যবান হইতে পারিয়াছেন তো?'[২৪] ১৩৩১ বঙ্গাব্দে সতীত্ব সম্পর্কে একটি দুঃসাহসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল *ভারতবর্ষ* পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায়। 'সতীত্ব মনুষ্যত্বের সংকোচক না প্রসারক' শীর্ষক এই প্রবন্ধটিতে কলকাতার বনেদী বাড়ির অন্তঃপুরের মধ্য থেকে রাধারাণী দত্ত ''সতীত্ব''–এর সংজ্ঞা নির্ধারণের প্রয়াস করার সাহস দেখিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন:

> সদগুণ ও সৌন্দর্য্যের প্রতি চিত্তের স্বতঃই আকৃষ্ট হওয়া মনোধর্ম্মেরই একটা দিক। ...পুরুষ যদি নারীর নিকট উল্লিখিত স্বতঃ–চিত্তাকর্ষী সুন্দর মনোবৃত্তিগুলির প্রভাবে অবনত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে বড় একটা কেহ তাহাতে আপত্তি করেন না। ... কেহই দূষণীয় বলিয়া মনে করেন না কিন্তু সেই একই কারণে নারী যদি কোনও পুরুষের নিকট নত হইয়া পড়ে, তখনই কেবল চারিদিক হইতে আপত্তির ঘোর কোলাহল শুনিতে পাওয়া যায়।[২৫]

সামাজিক বিশুদ্ধতার নামে ''সতীত্ব'' এর মতাদর্শের ভূত কিভাবে ভারতীয় নারীর মনোজগতকে অধিকার করে তাদের মানবিক অধিকারটুকুও সঙ্কুচিত করে তুলেছে, সে বিষয়ে রাধারাণী দেবী আলোকপাত করেছেন। যদিও তাঁর এই বক্তব্য যথেষ্ট বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল।

ঔপনিবেশিক বাংলার নারীজাগরণের অন্যতম পথিকৃত হিসেবে খ্যাত বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন দাসত্বকে স্ত্রীজাতির অসুখ বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি

'স্ত্রীজাতির অবনতি' প্রবন্ধে নারীর মানসিক দাসত্বের ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। নারী পুরুষের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করুক বা না করুক মানসিক দাসত্বের কারণে সে সর্বদা দাসী হয়েই থাকে 'যে স্থলে দরিদ্রা স্ত্রীলোকেরা সূচীকর্ম্ম বা দাসীবৃত্তি দ্বারা অর্থ উপার্জ্জন করিয়া পতি পুত্র প্রতিপালন করে, সেখানেও ঐ অকর্ম্মণ্য পুরুষেরাই স্বামী থাকে।'[২৬]

দাসত্বের এই নিদর্শন হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন স্ত্রীজাতির অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলিকে। তিনি লিখেছেন–

> ...আমাদের অতিপ্রিয় অলঙ্কারগুলি–এগুলি দাসত্বের নিদর্শন বিশেষ ! ...কারাগারে বন্দীগণ পায়ে লৌহনির্ম্মিত বেড়ী পরে, আমরা (আদরের জিনিষ বলিয়া) স্বর্ণরৌপ্যের বেড়ী অর্থাৎ মল পরি। ...আমাদের হাতকড়ী স্বর্ণ বা রৌপ্য–নির্ম্মিত চুড়ি! ...লোহার বালাও বাদ দেওয়া হয় না! কুকুরের গলে যে গলাবন্ধ (dogcollar) দেখি, উহারই অনুকরণে বোধ হয় আমাদের জড়োয়া চিক নির্ম্মিত হইয়াছে।[২৭]

তবে রোকেয়া পুরুষতন্ত্রের বিরোধিতা করলেও, তিনি পুরুষ বিরোধী ছিলেন না। তিনি নারী–পুরুষের সাম্য নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন,

> পুরুষদের স্বার্থ এবং আমাদের স্বার্থ ভিন্ন নহে — একই। তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য যাহা, আমাদের লক্ষ্যও তাহাই। শিশুর জন্য পিতামাতা উভয়েরই সমান দরকার। কি আধ্যাত্মিক জগতে, কি সাংসারিক জীবনের পথে— সর্ব্বত্র আমরা যাহাতে তাহাদের পাশাপাশি চলিতে পারি, আমাদের এরূপ গুণের আবশ্যক।[২৮]

বিবাহ প্রসঙ্গ :

বিবাহ প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে হওয়া লিঙ্গবৈষম্যের বিরুদ্ধেও বেশ কিছু মহিলার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ। গোটা সমাজের প্রেক্ষিতে সংখ্যায় খুব নগণ্য হলেও তারা বিধবাবিবাহ,বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। লোকনিন্দার ভয়ে নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক হলেও কখনও এককভাবে, কখনোও বা দলবদ্ধভাবে মহিলারা পুরুষ সম্পাদিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিজেদের অবস্থার কথা জানাতে পেরেছিলেন। ১২৬৭ বঙ্গাব্দে *সোমপ্রকাশ* পত্রিকার পাতায় বামাসুন্দরী দেবী বালবিধবাদের করুণ পরিণতির জন্য প্রচলিত বাল্যবিবাহের রীতি এবং কৌলিণ্যপ্রথাকে দায়ী করেছেন। সেই সাথে দায়ী করেছেন জাতির জাত্যভিমানকে।

নারীহিতৈষী পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ চেয়েছিলেন সমাজকে ভ্রূণহত্যার পাপের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। বিধবা বিবাহের সপক্ষে যুক্তির ক্ষেত্রেও তিনি কখনোই পিতৃতন্ত্রের বিরোধিতা করেননি। বরং তিনি পরাশর সংহিতার মত শাস্ত্রকেই হাতিয়ার করেছিলেন। কিন্তু মেয়েদের কন্ঠে প্রকাশ পেয়েছিল তাদের

মানসিক ইচ্ছার কথা। এমনকি পুরুষসম অধিকার লাভের প্রসঙ্গও। তাঁরা লিখেছেন 'পুরুষের যেমন বিবাহ করিতে অনুরাগ তেমন কি স্ত্রীর নাই?'[২৯] তারা চায় নিজের পছন্দমতো পতি নির্বাচন করার, নিজের ভালোবাসার মানুষকে স্বাধীনভাবে বিবাহ করার অধিকার।১২৪১ বঙ্গাব্দে লেখা চুঁচুড়ানিবাসী স্ত্রীগণ–এর চিঠিতেও একই বক্তব্যের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল, 'বলদ ও অচেতন দ্রব্যাদির ন্যায় আমারদিগকে কি নিমিত্ত হস্তান্তর করিয়া আপনারা নির্দ্দয়াচরণ করিতেছেন আমরা কি আপনারাই বিবেচনাপূর্ব্বক স্বামী মনোনীত করিতে পারি না।'[৩০] বিধবার পুনর্বিবাহের অধিকার প্রসঙ্গে লিখেছেন,

> যখন পুরুষরা এক স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অন্য স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারেন, তাহাতে পাপগ্রস্থ হইতে হয় না, তখন পতিহীনা অবলা কামিনীরা পুনরায় বিবাহ করিলে তাহারা তাহাতে কেন দূষিত হয়েন?[৩১]

আবার কারো কারো কথায়, বিধবার পুনর্বিবাহই তাদের উদ্ধারের একমাত্র পথ হতে পারে না। বিধবাদের স্বনির্ভরতার শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার বিকল্প পথের সন্ধানও পাওয়া গেছে মেয়েদের কণ্ঠে। বিবাহের বন্ধনে পুনর্বার জীবনকে আবদ্ধ না করে তারা বিকল্প পথের সন্ধান করেছিল— ১) বিধবাশ্রমের পরিকল্পনা এবং ২) বিধবা মহিলাদের অর্থনৈতিক উপার্জন বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে। স্বর্ণকুমারীদেবী, সরলাদেবীও বিভিন্ন নারী সমিতি স্থাপন করে মেয়েদের স্বনির্ভরতার কথা বলেছিলেন। আর অনেকটা এমনই সুর প্রতিফলিত হয়েছিল প্রমীলাসুন্দরী দেবীর 'বিধবা' প্রবন্ধটিতে (*অন্তঃপুর*, ভাদ্র ১৩১০)। তিনি লিখেছিলেন–

> আমি এখানে বিধবার বিবাহের কথা তুলিতে চাহি না। বিবাহের মধ্যে সকল সুখ শান্তি কর্তব্য আবদ্ধ আছে, একথা কখনোই সম্ভব নহে। আমাদিগের মত স্বামীহীনা, বালিকাদিগের প্রতি করুণ কোমল দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করুন, যাহাতে তাহারা আপন পবিত্র জীবনের গুরুদায়িত্ব বুঝিতে ও বহিতে সক্ষম হয়।[৩২]

রাজনৈতিক অধিকার প্রসঙ্গ :

শিক্ষিত বাঙালি সমাজে রাজনৈতিক পরাধীনতার চেতনা সুনির্দিষ্ট রূপ নেবার আগেই শিক্ষিত উচ্চবিত্ত–মধ্যবিত্ত পরিবারের বাঙালি মেয়েরা তাদের সামাজিক পরাধীনতার প্রশ্নে সরব হয়েছিলেন। তাই বলে মেয়েরা যে কেবল নিজেদের সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন তা নয়, বিশ শতকের মেয়েরা দেশের একজন সদস্য হিসেবে পরাধীন দেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন পত্রিকার পাতায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশক থেকেই নানাভাবে জাতীয়তাবাদী ভাবনা প্রকাশ পাচ্ছিল

মেয়েদের কলমে। বঙ্গভঙ্গের উত্তাল পরিস্থিতিতে নারীও কিভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য পুরুষের পাশে দাঁড়াতে পারে — সেই বিষয়টিকে উপজীব্য করে স্বর্ণকুমারী দেবী *ভারতী* পত্রিকার পাতায় লিখেছিলেন 'রমণীর স্বদেশব্রত'[৩৩] প্রবন্ধটি। দেশমাতৃকার দুর্দিনে দেশের হিতসাধনের জন্য আমাদের কোন পথে এগোনো উচিত, কি কি করণীয় — এইসব বিষয়ে স্বর্ণকুমারী দেবী আলোকপাত করেছেন তাঁর 'রাজনৈতিক প্রসঙ্গ' (শ্রাবণ ১৩১৫) 'আমাদের কর্ত্তব্য' (ভাদ্র ১৩১৫) 'কর্ত্তব্য কোন পথে' (পৌষ ১৩১৫) প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে।

১৩০৬ বঙ্গাব্দে *ভারতী* পত্রিকার ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত 'শান্তিচর্চা' প্রবন্ধে ইউরোপীয় জাতি বিদ্বেষ ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণের প্রতি ধিক্কার প্রকাশ পেয়েছে সরলাদেবীর লেখায়।[৩৪] তিনি 'বিলাতী ঘুসি বনাম দেশী কিল' (১৩১০, আষাঢ়) প্রবন্ধে ইংরেজ অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে বাঙালি যুবকদের পাল্টা আক্রমণের পরামর্শ দিয়েছেন। দুর্বল বাঙালি যুবকদের শক্তি সাধনায় উদ্বুদ্ধ করতে, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে শরীর ও অস্ত্রচর্চার প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রচলন করেন প্রতাপাদিত্য উৎসব, উদয়াদিত্য উৎসব, বীরাষ্টমী ব্রত ইত্যাদি।

ভারতী-তে অনিন্দিতা দেবী তাঁর পারিবারিক ও রাষ্ট্রসামাজিক কর্ত্তব্য (*ভারতী*, আশ্বিন ১৩৩০) নামক প্রবন্ধটিতে রাষ্ট্রসমাজের প্রতি নারীর কর্তব্য আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, পুরুষদের মতো নারীরও রাষ্ট্রসমাজও পরিবারের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে, কারণ পুরুষের মতো নারীও পরিবারের সদস্য। আর বহু পরিবারের সমবায়ে এক-একটি রাষ্ট্রসমাজের জন্ম হয়েছে। রাষ্ট্রসমাজের আইন-কানুন নারী-পুরুষ উভয়কেই মেনে চলতে হয়। তিনি প্রশ্ন করেছেন আইন লঙ্ঘন করলে যখন মহিলা বলে কোনো ছাড় দেওয়া হয় না। তাহলে রাষ্ট্র সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে মেয়েদের বাধা কোথায়?[৩৫]

কেবলমাত্র *ভারতী* পত্রিকাই নয়, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বাংলার মেয়েদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বহু পত্রপত্রিকা যথেষ্ট উদ্যোগী হয়েছিল। ১৯০৫-১৯০৮ সালের মধ্যে *ভারত-মহিলা* এবং *সুপ্রভাত* নামে দুটি সাময়িক পত্র প্রকাশিত হয়েছিল দুজন সমাজসংস্কারক নারীর তত্ত্বাবধানে সরযূবালা দত্ত এবং কুমুদিনী মিত্র। সরযূবালা দত্ত নিজে *ভারত-মহিলা* পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লিখেছেন, 'রাজনীতি হউক আর শিল্প-বিজ্ঞানই হউক, পুরুষের পার্শ্বে নারী দণ্ডায়মান না হইলে পুরুষ শক্তি কখনও সম্যক বিকশিত হতে পারে না।'[৩৬] অর্থাৎ রাজনীতিতেও পুরুষের পাশে নারীকে প্রয়োজন সেই বিষয়টিই স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হয়েছে। স্বদেশী আন্দোলনে স্বদেশীদের প্রতিজ্ঞায় দেশের মেয়েদেরকেও

সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়ে কুমুদিনী মিত্র *ভারত–মহিলা* পত্রিকার ১৩১২ বঙ্গাব্দের ভাদ্র সংখ্যায় লিখেছেন, 'রমণীগণ স্বদেশানুরাগে পুরুষদিগের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবেন কেন? তাঁহারা পুরুষদিগের সহিত মিলিত হইয়া স্বদেশের কল্যাণসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হইলে পুরুষেরা কখনো এই শুভকার্যে সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইবেন না।'[৩৭] বিদেশী দ্রব্য বর্জন করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের সংকল্পে পুরুষের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও এগিয়ে আসার উদ্দেশ্যে লিখেছেন,

> মহিলাগণ কি স্বদেশের দুঃখে মর্মাহত হইতেছেন না? তাঁহারা কি ইহার নিবারণার্থে কোনো উপায় অবলম্বন করিবেন না? ...আমরাও স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করি যে, স্বদেশী দ্রব্য পাইলে বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিব না এবং যে দ্রব্য স্বদেশে না পাওয়া যায় তাহা অন্য দেশ হইতে ক্রয় করিব, তথাপি ইংল্যাণ্ডজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব না।[৩৮]

অন্যদিকে *নবনূর* পত্রিকার ১৩১২ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় খায়রুন্নেসা খাতুন 'স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, ঘরের বাইরে গিয়ে সভাসমিতি না করেও কিভাবে দেশের মঙ্গলার্থে পুরুষজাতির পাশে দাঁড়াতে পারে বাংলার মেয়েরা। নারীজাতির উদ্দেশ্যে তাঁর অভিমত হল,

> এই মহা আন্দোলনের সময়...আমাদেরও সাধ্য মত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। তাই বলিয়া আমি তোমাদিগকে বিরাটসভার আয়োজন করিতে বলিতেছি না, অথবা বক্তৃতার জন্য টাউনহলে ও রাস্তাঘাটে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেছি না। আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে ঘরের এক পার্শ্বে বসিয়াই পুরুষজাতির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব।[৩৯]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লেখা বেশিরভাগ প্রবন্ধগুলির মধ্যেই নব্য পিতৃতন্ত্র নির্মিত জাতীয়তাবাদী ভদ্রমহিলা তত্ত্বের আভাস লক্ষ্যণীয়। বাঙালি নারীর মূল্যবোধের বিচ্যুতি না ঘটিয়ে কিভাবে তাদেরকে দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে, এটাই ছিল অধিকাংশ প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। বিদেশী জিনিস বয়কট করে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার, স্বদেশী ভাণ্ডারে গয়না কিংবা অর্থদান, স্বামী–পুত্রকে বীরোচিত কাজে উৎসাহিত করা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অন্তঃপুরের পরিসরের মধ্যে থেকেই নারীর দেশানুরাগ প্রদর্শন ছিল কাম্য। এর জন্য প্রথা বহির্ভূত কোনো বিপ্লবী কর্মপন্থা যা সমাজস্বীকৃত নয় এমন কাজের নির্দেশ মহিলাদের কলমেও প্রকাশ পায়নি। জাতীয়তাবাদী নব্যপুরুষের সুযোগ্য সহধর্মিণীরূপে পারিবারিক জীবনের গণ্ডির মধ্যে দাঁড়িয়েই স্বদেশসেবায় নিজেকে এমনভাবে নিয়োজিত করতে হবে, যাতে বাঙালি নারী এক মহান আদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে উঠতে পারে এবং

বিদেশী শক্তির হাতে পরাজিত বাঙালি পুরুষ তার জয়ের স্মারক হিসেবে অন্দরমহলকে বিশ্ববাসীর কাছে সগৌরবে উপস্থাপন করতে পারে, এই ছিল নব্য জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যকে পাথেয় করে কিভাবে পুরুষ ও পরিবারের স্বার্থবিরোধী কোনো পদক্ষেপ না নিয়ে অতি সন্তর্পণে পদচারণার মধ্য দিয়ে বাঙালি নারী বহির্বিশ্বের বিচিত্র কর্মজগতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে একটু একটু করে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেছিল সেই কৌশলের অনেকটাই পরিস্ফুট হয়ে ওঠে বিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের প্রবন্ধগুলির ধারাবাহিক পর্যালোচনার মাধ্যমে।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে মেয়েরা যেভাবে দেশভক্তির 'স্ত্রীজনোচিত' পরিচয় দিয়েছে তাতে এটা প্রমাণিত হয়েছিল যে তাঁরা নিজেদের চিরাচরিত ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়েই দেশের রাজনৈতিক বিষয়ে যোগদানের যোগ্য। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মেয়েদেরকে নিয়ে সংগঠিত নারী সংগঠনগুলি বৃহত্তর জনজীবনের কিছু বাছাই করা ক্ষেত্রে মেয়েদের প্রবেশাধিকার বিষয়ে বেশ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। সেই সঙ্গে মেয়েদের রাজনৈতিক ও আইনি অধিকার ব্যাপারেও যথেষ্ট সচেতন ছিল। ১৯২১ সালে বাংলার মেয়েদের ভোটাধিকারের আন্দোলনে সামিল হওয়া 'বঙ্গীয় নারী সমাজ' সংগঠনটির যুক্তি ছিল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও শিশুকল্যাণের মতো বিষয়গুলিতে শিক্ষিত মহিলাদের নিজস্ব বক্তব্য জানাবার এবং আইনি সংস্কার কিংবা সংশোধন সম্বন্ধে সুপারিশ করবার অধিকার থাকা প্রয়োজনীয়। রাজনীতিকে যারা মেয়েদের কাজ নয় বলে দূরে সরিয়ে রাখতে চান তাঁদের উদ্দেশ্যে কুমুদিনী বসু লিখেছিলেন,

> এমন কোনো বিষয় নেই যা পরিবারের ওপরপ্রভাব ফেলে না। শিশুশিক্ষা, শিশুকল্যাণ, প্রসূতি সেবা, গৃহনির্মাণ, শৌচব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, নেশাজনিত সমস্যা, অর্থনীতি যুদ্ধ (মেয়েরা পুত্রসন্তানের জন্ম দেয় এবং তাদের যুদ্ধে পাঠায়। তাছাড়া, তারা যুদ্ধের সময় আরো নানাধরণের কাজ করে, যেমন গত বিশ্বযুদ্ধে করেছে) ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারেই মেয়েরা জড়িয়ে আছে। কাজেই রাজনীতিকে একটা আলাদা কুঠুরীতে বন্ধ করে কখনো বলা যায় না যে এই কাজগুলো মেয়েদের কাজ নয়।[৪০]

১৯২১ সালের আইনসভায় ৩৭ জন বিধায়কের সমর্থন পেলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ বিরোধীদের চাপে মেয়েদের সীমিত ভোটাধিকারের প্রস্তাবটি বাতিল হয়ে যায়। বিরোধীদের মধ্যে অনেকেই মনে করেছিলেন ভোট দিতে বাহির মহলে আসতে হলে এবং রাজনীতিতে প্রবেশ করতে হলে মেয়েদের লজ্জাশরম জলাঞ্জলি দিতে হবে। মেয়েদের ভোটাধিকারের বিরোধিতা করে বর্ধমানের শহীদ সুহ্রাওয়ার্দি প্রশ্ন করেছিলেন, বাংলার মেয়েরা এযাবৎকাল পর্যন্ত এমন কি কাজ করেছে যার ভিত্তিতে তারা ভোটাধিকার দাবি করতে পারে। তাঁর এই প্রশ্নের জবাবে সুলতানা মোয়াজ্জাদা দ্য

স্টেটম্যান কাগজে পাল্টা প্রশ্ন করে লেখেন, বাংলার মেয়েদের বিশেষ করে মহামেডান মেয়েদের, পিছিয়ে পড়া অবস্থার জন্য দায়ী কারা। তাঁর প্রশ্ন, এটা বললে কী অন্যায় হবে যে, আমাদের মাননীয় বিরোধীর মতো পুরুষদের জন্যই এই প্রদেশের মেয়েদের এরকম হীণাবস্থা?[৪১]

এমনই বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভায় নারীদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্পত্তির উপর ভিত্তি করে। ১৯৩৫ সালে 'ভারত শাসন আইন'-এ মহিলাদের জন্য আইনসভায় আসন সংরক্ষণ করা হয় এবং মহিলা ভোটারের অনুপাত বাড়িয়ে ১:৫ করা হয়।

এই প্রেক্ষাপটে শামসুন নাহার 'নারীর রাষ্ট্রনৈতিক অধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্র বাংলার মেয়েদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণের বিষয়টির ব্যাপারে আলোকপাত করেছেন। তিনি *সওগাত* পত্রিকার ১৩৪২ বঙ্গাব্দের কার্তিক সংখ্যায় বোম্বাই এবং মাদ্রাজ প্রদেশের মহিলাদের তুলনায় বাংলার মেয়েদের ভোটাধিকার বিষয়ে সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিষয়গুলি স্পষ্টরূপে তুলে ধরেছেন। তিনি এ ব্যাপারে কৌতুকের সুরে লিখেছেন–

> এই বৈচিত্র্যপূর্ণ জগতে কৌতুকপ্রদ বিষয়ের অভাব নাই। বঙ্গনারীর ভোটাধিকারের বেলায়ও ব্যাপার দাঁড়াইল ঠিক একইরূপ। ভারতীয় শাসনসংস্কার উপলক্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বড় বড় মস্তিষ্কগুলি তোলপাড় হইল, অথচ বাংলাদেশের হতভাগ্য মেয়েরা সকলে সমানভাবে কি করিয়া ন্যায্য অধিকার ভোগ করিতে পারেন সেই পরামর্শ কোথাও পাওয়া গেল না। ...কতশতপ্রকার নির্বাচন পদ্ধতি জানা থাকিতে বঙ্গ নারীর জন্য সকলপ্রকার ব্যবস্থাই হইয়া দাঁড়াইল অসম্ভব।[৪২]

যদিও এর আগে ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে লেখা লীলা নাগের 'ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রতন্ত্রে নারীর স্থান' শীর্ষকপ্রবন্ধে বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি এবং বাংলার মেয়েদের মধ্যেকার রাজনৈতিক অধিকারের ব্যবধান প্রসঙ্গে কথা উঠলেও তিনি এ বিষয়ে তেমন কোনো প্রতিক্রিয়া জানান নি। বরং লিখেছিলেন, বাংলার মেয়েদের নিজেদেরকে গড়ে তুলতে হবে রাষ্ট্রীয় কাজে যোগদানের উপযুক্ত রূপে। তবেই তারা পুরুষসমাজের কাছ থেকে বিরুদ্ধতার পরিবর্তে পাবে সম্মান ও সাহায্য।[৪৩]

একটি বিষয় স্পষ্টভাবেই লক্ষ্যণীয় যে, মেয়েরা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য ঠিক কতটা ছাড় চাইলে অন্তত কিছু প্রভাবশালী পুরুষ ব্যক্তিত্বের সমর্থন পাওয়া যাবে এবিষয়ে বেশ সচেতনতার সাথেই এগিয়ে চলেছিলেন। বাইরের জগতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে তারা বেশিরভাগ সময়েই পুরুষ নির্দেশিত পথেই এগোনোর

কথা বলেছেন। আন্দোলনরত অধিকাংশ নারীই হয়তো সেদিন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্পষ্ট বিদ্রোহ মেয়েদের অধিকার আদায়ের পথকে অবরুদ্ধ করতে পারে, এর ফলে স্বাধীনতা আন্দোলনে মেয়েদের আরোও বেশী করে কোণঠাসা হয়ে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেইসময়কার দেশকালগত পরিস্থিতিতে নারীর এ ভাবনা নিছক অমূলকও ছিলনা। তাই তৎকালীন নারী সংগঠনগুলিও নারীমুক্তির জন্য এমন কোনো পদক্ষেপ নিতে চায়নি যাতে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের লড়াই থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো নারী আন্দোলন তৈরী হয় যা নারী–পুরুষের সংঘাতকে বৃদ্ধি করবে।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, মেয়েদের সব লেখায় সবসময় নারীবাদী উচ্চারণই পাওয়া গেছে এমন নয়, মেয়েদের লেখার মধ্যেও কম বেশী স্ববিরোধিতা বিদ্যমান ছিল। নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী, কৃষ্ণভাবিনী দাস, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলাদেবী, রোকেয়ার লেখাও মানসিক দ্বন্দ্ব কিংবা স্ববিরোধিতার ঊর্ধ্বে ছিল না। মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বনের প্রয়োজন আছে কি না তা নিয়ে দোলাচল দেখা গিয়েছে কৃষ্ণভাবিনী দেবীর লেখাতে। বিধবাবিবাহ উচিত কিনা সেই বিষয়েও দোলাচল দেখা গিয়েছে সমকালীন লেখিকাদের মধ্যে। ১৩৩০ বঙ্গাব্দে নারীমন্দির প্রবন্ধে সরলাদেবীর মধ্যে যে ধরণের নারীবাদী সচেতনতা প্রকাশ পেয়েছে, তা কিন্তু তাঁর সূচনা পর্বের লেখালেখিতে প্রকাশ পায় নি। এমনকি বাংলার নারীবাদের অন্যতম পথিকৃৎ রোকেয়ার লেখাতেও আত্মদ্বন্দ্ব দোলাচল বিদ্যমান। 'অবরোধবাসিনী' তে[৪৪] রোকেয়া পর্দাপ্রথার বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন, তিনিই আবার 'বোরকা' প্রবন্ধে[৪৫] বোরখা–কে সমর্থন করেছেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেছেন, তবে তার প্রয়োজনীয়তাকে ব্যাখ্যা করেছেন সুগৃহিনী হওয়ার প্রাথমিক শর্ত হিসেবে। অর্থাৎ সমসাময়িক যুগের লেখিকাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কম বেশি মানসিক টানাপোড়েন ছিল।

তবে শুধু সেযুগের মেয়েদের মধ্যেই নয়, পুরুষের মধ্যেও ছিল দোলাচল। উনিশ ও বিশ শতকের ভারতীয় সংস্কারবাদী পুরুষেরাও সেসময় পুরোনো ঐতিহ্যের সংরক্ষণ এবং সংস্কার এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে ভুগেছিলেন ব্যাপক ভাবে। যদিও সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এমন দোলাচল ছিল স্বাভাবিক। আসলে ঔপনিবেশিক বাংলায় নারী সম্পর্কিত ভাবনার জগতটা একমাত্রিক ছিল না, বরং তা ছিল দ্বন্দ্বদীর্ণ, পরস্পরবিরোধী চিন্তাস্রোতে জটিল, বহুমাত্রিক। আর এই বহুমাত্রিক ভাবনার জগতে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে মেয়েদের পক্ষে কোনো একরৈখিক পথ বেছে নেওয়া সম্ভব হয়নি। এসময়ে 'dominant discourse' আর 'counter discourse' বলে নির্দিষ্ট কোনো ধারণা খুঁজে পাওয়া খুব মুশকিল। কারণ মেয়েদের মধ্যেও অনেকেই সেসময়ে পিতৃতান্ত্রিক স্বরেই সুর মিলিয়েছে। তবে দোদুল্যমানতা সত্ত্বেও মেয়েরা কথা বলেছে, তাঁরা নিজেদের মতো করে ভেবে

একটা অবস্থানে আসতে চেয়েছে। তাঁরা একেবারেই নিষ্ক্রিয়ভাবে অন্য কোনো লোকের ঠিক করে দেওয়া মতাদর্শকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেয়নি। তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শকে নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করেছেন। নিজেরাই সচেষ্ট হয়েছেন নিজেদের জীবনের সমস্যাগুলো সমাধানে। পিতৃতন্ত্রের সাথে লড়াইয়ে সবসময় যে মেয়েরা প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই মনে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব না থাকলেও নিজেদের অধিকার অর্জনের জন্য প্রতিবাদ করার পরেও এক পা পিছিয়ে এসে আপস–রফার পথকেই কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছিল মেয়েরা। তারা ভেবেছিল, কিছু পুরুষের বিরুদ্ধতা থাকলেও অন্ততপ্রগতিপন্থী পুরুষের সমর্থন আদায় করে, তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হতে পারবে। সব ক্ষেত্রে পিতৃতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরাসরি বিদ্রোহের পথ যে নারীর অধিকার আদায়ের পথকে অবরুদ্ধ করতে পারে সে বিষয়ে বেশ সচেতন ছিল মেয়েরা। তাই তাঁরা এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ভাবেননি, যাতে করে সমাজে মেয়েরা আরও বেশি কোণঠাসা হয়ে পড়তে পারে। পিতৃতন্ত্রের সাথে যুঝতে চাওয়ার এই কৌশলও বাংলার মেয়েদের সক্রিয় অবস্থানকেই চিহ্নিত করে।প্রমাণ করে যে তাঁরা কোনোভাবেই নিষ্ক্রিয় ছিলেন না। এককথায় তাঁরা তাঁদের লেখনীর মধ্য দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিসত্তা তথা মনোজগতকে উন্মোচিত করেছেন, উন্মোচন ঘটিয়েছেন তাঁদের subjectivity কে। নীতা কুমারের ভাষায়,

> A woman as subject is discontinuous and apparently contradictory, not consistent, unified or freely choosing, but a palimpsest of identities, constituted and reconstituted, constantly in flux.[৪৬]

তথ্যসূত্রঃ

১। Miriam Schneir,ed.*Feminism: The Essential Historical Writings* (New York: Vintage, 1972), p.xiv.

২। Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905* (Princeton: Princeton University Press,1984), pp.24-30.

৩। Partha Chatterjee, 'The Nationalist Resolution of the Womens Question' in eds. KumkumSangari, Sudesh Vaid, 'Recasting Women: Essays in Colonial History' (New Delhi: Kali for Women,1989), pp.238-39.

৪। Geraldine Forbes, 'Caged Tigers: First Wave Feminism in India',*Womens Studies International Forum*, 5 (1982):525-36.

৫। Samita Sen, Nandita Dhawan, 'Feminisms and the Politics of Gender: A History of the Indian Womens Movements' in eds. Nirmala Banerjee, Samita Sen, Nandita Dhawan, 'Mapping the Field: Gender Relations in Contemporary India ',vol. 1, (Kolkata: Stree, 2011), pp.1-40.

৬। গোলাম মুরশিদ, নারী প্রগতির একশো বছর:রাসসুন্দরী থেকে রোকেয়া (ঢাকা: অবসর প্রকাশনা, ১৯৯৩), পৃ. ৯০–৯৬।

৭। সুতপা ভট্টাচার্য, সম্পা.বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৯), পৃ. ১৫৮–১৫৯।

৮। মধুমতী মুখোপাধ্যায় *পুরস্কৃত প্রবন্ধ*, *বামাবোধিনী পত্রিকা*, আশ্বিন (১২৭২): ১১৮।

৯। অরুণা চট্টোপাধ্যায়,সম্পা. *কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ* (কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি,১৯৬০), পৃ. ৭৯–৮৩।

১০। চট্টোপাধ্যায়,সম্পা.*কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিতপ্রবন্ধ*, পৃ. ১৬৩–১৬৪।

১১। চট্টোপাধ্যায়,সম্পা.*কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিতপ্রবন্ধ*, পৃ. ১৬৭।

১২। চট্টোপাধ্যায়,সম্পা.*কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিতপ্রবন্ধ*, পৃ. ১৬৫–১৬৬।

১৩। শর্মিষ্ঠা দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিতঃ নির্বাচিত সংবাদ–সাময়িকপত্রে বাঙালি মেয়ের সমাজভাবনা* ১৯২৭–১৯৬৭, (কলকাতা: স্ত্রী, ২০০৭), পৃ. ১৯৬।

১৪। ভট্টাচার্য, সম্পা.*বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, পৃ. ৭।

১৫। ভট্টাচার্য,সম্পা.*বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, পৃ. ৮–৯।

১৬। অভিজিৎ সেন এবং অভিজিৎ ভট্টাচার্য,সম্পা.*স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ* (কলকাতা : বিকল্প প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১০৫–১১০।

১৭। সেন এবং ভট্টাচার্য, সম্পা.*স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ*, পৃ. ২১২।

১৮। সেন এবং ভট্টাচার্য, সম্পা.স্বর্ণকুমারী দেবীর সংকলিত প্রবন্ধ, পৃ. ২১২।

১৯। চট্টোপাধ্যায়,সম্পা.*কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ২১–২২।

২০। অভিজিৎ সেন এবং অনিন্দিতা ভাদুড়ী,সম্পা. *গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর গদ্য সংগ্রহ*, (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং, ২০০১), পৃ. ৩৩।

২১। ড. শঙ্কর প্রসাদ চক্রবর্তী, সম্পা.*সরলাদেবী চৌধুরাণী রচনা সংকলন* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিং,২০১১),পৃ. ২৫১।

২২। অভিজিৎ সেন,সম্পা.*অনিন্দিতাদেবীর রচনা–সংকলন* (কলকাতা: দেজ পাবলিশিংএবং স্কুল অফ উইমেনস স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪), পৃ. ২৬৯।

২৩। চট্টোপাধ্যায়, সম্পা.*কৃষ্ণভাবিনী দাসের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, পৃ. ১৬৯–১৭১।

২৪। সেন,সম্পা.*অনিন্দিতাদেবীর রচনা–সংকলন*, পৃ. ১২৩।

২৫। অভিজিৎ সেন, সম্পা.*রাধারাণী দেবীর রচনা–সংকলন*,প্রথম খণ্ড (কলকাতা: পুস্তক বিপণি, ১৯৯৯), পৃ. ৫।

২৬। কাদির, সম্পা.*রোকেয়া রচনাবলী* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭১), পৃ. ১৯।

২৭। কাদির, সম্পা.*রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ১৩।

২৮। কাদির, সম্পা.*রোকেয়া রচনাবলী*,পৃ. ২১।

২৯। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* দ্বিতীয় খণ্ড (কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য

পরিষৎ, ১৪০১), পৃ. ২৫৭-২৫৮।
৩০। বন্দ্যোপাধ্যায়, *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, পৃ. ২৫৭-২৫৮।
৩১। ভট্টাচার্য, সম্পা. *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, পৃ. ১২০।
৩২। ভট্টাচার্য, সম্পা. *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, পৃ. ১৪০।
৩৩। স্বর্ণকুমারী দেবী, *রমণীর স্বদেশব্রত*, *ভারতী*, পৌষ (১৩১২):৩৩৯।
৩৪। অভিজিৎ সেন ও অনিন্দিতা ভাদুড়ী, সম্পা. *সরলাদেবী চৌধুরাণীর নির্বাচিত প্রবন্ধ সংকলন*,(কলকাতা: দেজ পাবলিশিং,২০০৪), পৃ. ৮৪।
৩৫। অভিজিৎ সেন, সম্পা. *অনিন্দিতাদেবীর রচনা-সংকলন*, পৃ. ৩১৮-৩২৪।
৩৬। দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিত*, পৃ.২৬।
৩৭। ভট্টাচার্য, সম্পা. *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, পৃ. ৫৮।
৩৮। ভট্টাচার্য, সম্পা. *বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য*, পৃ. ৫৭।
৩৯। শাহীন আখতার ও মৌসুমী ভৌমিক সম্পা. *জানানা মহিফলঃ বাঙালি মুসলমান লেখিকাদের নির্বাচিত রচনা* ১৯০৪-১৯৩৮,(কলকাতা স্ত্রী,১৯৯৮),পৃ. ৪৩।
৪০। দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিত*, পৃ. ১৭।
৪১। দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিত*, পৃ. ১৮।
৪২। দত্তগুপ্ত, *পথের ইঙ্গিত*, পৃ. ১৫৭।
৪৩। দত্তগুপ্ত, , পৃ. ৫৪।
৪৪। কাদির, সম্পা. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৩৬৯-৪০৬।
৪৫। কাদির, সম্পা. *রোকেয়া রচনাবলী*, পৃ. ৪০-৪৪।
৪৬। Nita Kumar,ed.*Women as Subjects: South Asian Histories* (Virginia: University of Virginia Press, 1994), p.15.